জেলার ঐতিহ্য

পাবনা জেলার লোক সংঙ্গীত , লোকগাঁথা, লোকনৃত্য, কৌতুক, নকশা, পালাগান, ইত্যাদি লোকসংস্কৃতিতে অত্যমত্ব ঐতিহ্য মন্ডিত। অতি পুরাতনকাল হতেই এ জেলার বস্ত্র শিল্প প্রসিদ্ধ , গ্রামে গ্রামে বস্ত্র বয়নকারী হিন্দু মুসলমান উভয় জাতি সম্প্রদায় মিলে মিশে কাজ করে। হান্ডিয়ালের বিবরন প্রসংগে অবগত হওয়া যায় একমাত্র এখানেই কোম্পানি আমলের সমস্ত ভারতবর্ষের চার পঞ্চমাংশ রেশম আমদানি হত। পাবনার সাদুলনাপুর,সুজানগর,দোগাছি,শিবপুর,সিলিমপুরের সহ অনেক এলাকায় রয়েছে তাঁতী সম্প্রদায়। দোগাছির শাড়ী ও লুঙ্গী দেশ খ্যাত। পাবনা ব্যতীত অন্য কোথাও কাপড় প্রস্তত উপযোগী সূতা রংকারক দেখা যায় না। একটি সরকারী বিবরণী থেকে জানা যায় জেলার সাঁড়া , সাঁথিয়া , সুজানগর সহ অনেক এলাকায় ইক্ষু নির্ভর শিল্প রয়েছে। জেলায় প্রচুর পরিমানে সরিষা উৎপাদিত হয় , আর এর ফলে এখানে গড়ে উঠেছে অনেক তেল কল। পূর্বে খুলু সম্প্রদায় এই পেশার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, যন্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা আজ বিলুপ্ত পায়।

পাবনার ঐতিহ্যবাহী তাতশিল্প

তাঁত শিল্পে পাবনা জেলা সমৃদ্ধশালী। এখানকার শাড়ী, লুংগী ও গামছা বিদেশে রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। তাই তাঁত শিল্পের ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋন দিয়ে পাবনার তাঁত শিল্পকে আরো উজ্জীবিত করা প্রয়োজন। তাঁত শিল্প উজ্জীবিত হলে বহু কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং শাড়ী, লুংগী, গামছা বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সক্ষম। বস্ত্র শিল্পের মধ্যে পাওয়ার লুম ২৪টি, চিত্র রঞ্জন তাঁত ১৪১৮ টি, হস্তচালিত তাঁত ৩৭৮১ টি, গেঞ্জি তৈরী ৩৬৫ টি, সুতা পাকানো ২০টি, এমব্রয়ডারী ২৭টি।

বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে অনেক ঐতিহ্য যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করে। নিমেন উল্লেখযোগ্য স্থানগুতলোর বর্ণনা দেয়া হলোঃ

<u>ক) জোড়বাংলা মন্দিরঃ</u>

পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে দক্ষিণ রাঘবপুরে শহরের পূর্ব- দক্ষিণে এ জোড়বাংলা মন্দিরটি অবস্থিত। ঘনবসতিপূর্ণ রাঘবপুরে একটি শান বাঁধানো পুকুরের কাছে মন্দিরটি দন্ডায়মান আছে। চারিদিকে এত বাড়িঘর তৈরী হয়েছে যে, বাইরের রাস্তা থেকে এ মন্দির দেখা যায় না। পাবনায় জোড়বাংলা মন্দিরে কোন শিলালিপি নেই। ব্রিটিশ শাসন আমলে যখন ইমারতটি প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণের জন্য গৃহীত হয়েছিল তখনো এর কোন শিলালিপি ছিল

কিনা সে বিষয়ে কোনকিছু জানা যায়নি। স্থানীয় লোকমুখে প্রচলিত কাহিনীতে জানা যায় যে, ব্রজমোহন ক্রোড়ী নামক মুর্শিদাবাদের নবাবের এক তহশিলদার আঠার শতকের মধ্যভাগে এ মন্দির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরটি আয়তনে বৃহৎ না হলেও বাংলাদেশের সকল জোড়বাংলা নিদর্শনের মধ্যে সুন্দরতম। এ স্থাপত্য নিদর্শনটি কেবল ইটের পর ইট গেঁথে নির্মিত একটি ইমারত নয় বরং শিল্পীর আপনমনের মাধুরী মিশিয়ে খন্ড খন্ড টেরাকোটা ফলকে রচিত স্থাপত্যের একটি সার্থক কাব্য।

খ) তাড়াশ জমিদার ভবনঃ

পাবনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে বনমালী রায় বাহাদুরের তাড়াশ বিল্ডিং এখন পর্যন্ত প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে। পাবনার জমিদারদের মধ্যে সবচেয়ে নামকরা এবং পুরাতন বলে পরিচিত এই তাড়াশের জমিদার। সে সময়ের ভূস্বামী পরিবারগণই জমিদারবংশীয় বলে অভিহিত। বগুড়া জেলার চান্দাইকোণার কাছে 'কোদলা' গ্রামে একঘর কায়স্থ জমিদার ছিলেন; এই জমিদারই তাড়াশের রায়বংশের পূর্বপুরুষ বাসুদেব। তাড়াশের এই পরিবার ছিল পাবনা জেলার সবচেয়ে বড় জমিদার। বাসুদেব নবাব মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব বিভাগে চাকরি করে প্রতিষ্ঠা করেন রাজবাড়ী। নবাব মুর্শিদকুলি খান বাসুদেবকে ভূষিত করেন 'রায়চৌধুরী' খেতাবে। তার এষ্টেট ছিল প্রায় ২০০ মৌজা নিয়ে।

ছবিঃ রায় বাহাদুর বনমালী রায়

এই রায় বংশের বনমালীরায় ও বনওয়ারীলাল রায়ের নির্মাণ ঐতিহাবাহী বনমালী ইনস্টিটিউটও। জানা যায়, ১৯৪২ সনে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুদ্ধের আতঙ্কে এ জমিদার পরিবার তাদের পাবনা শহরে নির্মিত ঐতিহাসিক তাড়াশ বিল্ডিং এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাবনা অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জমিদারকর্তৃক নির্মিত তাঁদের অমরকীর্তি পাবনা শহরের তাড়াশ বিল্ডিং আজও তাঁদের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। আদিতে বনওয়ারীলাল ফরিদপুর থানার ডেমরাতে বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে এই স্থানের নাম হয় বনওয়ারীনগর। তাঁদের নির্মিত শহরের ভবনটি তাড়াশ রাজবাড়ী নামেও পরিচিত। পাবনা প্রাসাদোপম ভবনটির সম্মুখ ফাসাদ দ্বিতলবিশিষ্ট এবং চারটি সুডৌল বৃত্তাকার স্তম্ভ সহযোগে প্রাসাদের দ্বিতলের কক্ষটি নির্মিত। প্রাসাদের সামলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের শেষপ্রান্তে প্রবেশ ফটকটির দুপার্শ্বে দুটি করে চারটি স্তম্ভ এবং মাঝখানে বিশাল আকৃতির অর্ধবৃত্তাকার খিলানে প্রবেশপথটি সৃষ্ট। দৃষ্টিনন্দন প্রবেশপথটি সহজেই সকলের মন হরণ করে। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন আমলে ইউরোপীয় রেনেসাঁ রীতির প্রভাবে নির্মিত তাড়াশ জমিদারবাড়ী তাড়াশের জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের অর্থানুকূল্যের স্মৃতি নিয়ে জেগে আছে। তাড়াশ জমিদারদের পাবনা শহরে নির্মিত(রাজবাড়ী) প্রাসাদভবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এর প্রবেশ তোরণ। ভবনটি আয়তাকৃতির এবং এর আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩০.৪০ মিটার (১০০ ফুট) এবং প্রস্থ ১৮.২৮ মিটার(৬০ ফুট)। চারটি কোরিনথিয়ান স্তম্ভের উপরে আকর্ষনীয় দ্বিতল গাড়িবারান্দা সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষন করে। তাড়াশ জমিদার ভবনের দুই পার্শ্বে দুটি বর্ধিত অঙ্গ সংযুক্ত রয়েছে এবং সর্বত্র অর্ধ বৃত্তাকৃতির খিলান সুষমভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তাড়াশ রাজবাড়ী অনেক আগে থেকে সরকারী দফতর হিসেবে ব্যবহত হওয়ায় এখন পর্যন্ত সমসাময়িককালে নির্মিত অন্যান্য জমিদারবাড়ী থেকে ভালো অবস্থায় আছে এবং সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত ইমারতের তালিকাভূক্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে এ সম্পদ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ করে পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন করা হলে এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্পট হিসেবে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট খাতে আয়ের পথ সুগম করবে।

গ) শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গ(আশ্রম- মন্দির), হেমায়েতপুর, পাবনাঃ

পাবনা শহরের সন্নিকটে হেমায়েতপুর গ্রামে শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গ(আশ্রম- মন্দির) টি অবস্থিত। অনুকূল চন্দ্রের পিতা ছিলেন হেমায়েতপুর গ্রামের শ্রী শিবচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা ছিলেন শ্রী যুক্তা মনমোহিনী দেবী। সৎসঙ্গ আশ্রমটি আদিতে সাদামাঠা বৈশিষ্টে নির্মিত হয়েছিল; এতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়নি। তবে বর্গাকৃতির ভবনটির শীর্ষদেশ চারটি ত্রিভূজ আকৃতির ক্রমহ্রাসমান ছাদে আচ্ছাদিত ছিল। এ মন্দিরের শিখর ক্ষুদ্রাকৃতির কলস ফিনিয়ালে আকর্ষনীয় বৈশিষ্টমন্ডিত ছিল। মন্দিরের পাশেই শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পূজার ঘর অবস্থিত। এ ক্ষুদ্র ভবনটি গম্বুজবিশিষ্ট এবং ধনুক বক্র কার্নিশ ও গম্বুজের চারকোণে চারটি দৃষ্টিনন্দন শিখর ধারণ করে এক বৈচিত্রময় বৈশিষ্টের অবতারনা করেছে।

ছবিঃ অনুকুল ঠাকুর আশ্রম

শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দ্রের পিতা- মাতার স্মৃতিরক্ষার্থে এই মন্দির নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখ প্রাসাদে 'স্মৃতি মন্দির' কথাটি পাথরের উপরে উৎকীর্ণ করা আছে। অনুকূলচন্দ্র 'সৎসঙ্গ' নামে একটি জনহিতকর সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। প্রকৃত অর্থে অনুকূল ঠাকুর মানবকল্যাণে তাঁর জায়গা- জমি যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে গেছেন। স্মৃতিমন্দিরটি অন্যান্য ইমারতের তুলনায় এখনো সুসংরক্ষিত অবস্থায় আছে। সম্প্রতি নব নির্মিত সৎসঙ্গ- আশ্রম- মন্দির সমন্বয়ে গঠিত স্থাপত্য নিদর্শনটি সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষন করে। এখানে শ্রী শ্রী অনুকূল চন্দের জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীকে কেন্দ্র করে বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ সময় এখানে প্রচুর লোক/অতিথির সমাগম হয়। প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয় বলে জানা যায়। ভারত হতেও লোকজন এখানে আসেন। এ সম্পদের প্রয়োজনীয় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরী। সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে আশ্রম এলাকায় প্রয়োজনীয় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন করা হলে সারা বছরই এখানে দেশী/বিদেশী পর্যটকগণ আসা/যাওয়া করবেন। পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য একটি টুরিষ্ট স্পট হিসেবে বিবেচিত হবে ও সংশ্লিষ্ট খাতে আয়ের পথ সুগম করবে।

ঘ) মানসিক হাসপাতাল, হেমায়েতপুর, পাবনাঃ

পাবনা হেমায়েতপুরের মানসিক হাসপাতাল শহরের সন্নিকটে আনুমানিক ৩ কিঃ মিঃ পশ্চিমে অবস্থিত। এটি ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাবনা মানসিক হাসপাতাল মানসিক চিকিৎসায় দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। জানা যায়, এখানে রোগীদের প্রতিদিন গড় অবস্থানের সংখ্যা ৪২৫- ৪৫০ জন। হাসপাতালটি দীর্ঘদিনের পুরানো বিধায় এটির সার্বিক মেরামত/সংস্কার খুবই প্রয়োজন।

ঙ) ঈশ্বরদী উপজেলার পাকশীস্থ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও লালনশাহ সেতুঃ

পাবনা জেলা সদর হতে ঈশ্বরদী উপজেলার দুরত্ব আনুমানিক ২৫- ৩০ কিলোমিটার। যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল। ঈশ্বরদী উপজেলার ১টি ইউনিয়ন ও গ্রামের নাম পাকশী। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের পাশে এবং পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত। পাকশী

হার্ডিজ ব্রীজ, পাবনা

লালন শাহ সেতু

গ্রামে বাংলাদেশের রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিভাগীয় হেডকোয়ার্টার অবস্থিত। এছাড়াও পাকশী একটি প্রধান ব্রডগেজ রেলওয়ে স্টেশন। এ স্টেশনের আধা মাইল উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রধান রেলওয়ে অফিসগুলো ও কলোনী অবস্থিত। কলোনীর সুদৃশ্য ভবনগুলিতে রেল বিভাগের বিভিন্ন অফিসমূহ অবস্থিত। এ কলোনীর অভ্যন্তরে সকল রাস্তাই পাকা এবং চারপাশে বহু সংখ্যক বড় বড় বৃক্ষ সারি দিয়ে শোভিত। এর পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত পদ্মার দৃশ্য অতীব নয়নাভিরাম। পাকশী থেকেই বাংলাদেশ রেলওয়ের বৃহত্তম সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পদ্মা বক্ষ অতিক্রম করেছে। পাকশী সন্নিকটে এবং পাকশী ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত রূপপুর গ্রামে প্রস্তাবিত আণবিক প্রকল্পের স্থান নির্বাচন করা আছে। ব্রীজ সংলগ্ন স্থানে বেশ কিছু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কটেজ রয়েছে যেখানে দেশী বিদেশী পর্যটক অবস্থান করে পদ্মার সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে।

ছ) ফরিদপুরের স্মৃতিঘেরা রাজবাড়ীঃ

পাবনা জেলা সদর হতে ফরিদপুর উপজেলার দুরত্ব আনুমানিক ৪৫-৫০ কিলোমিটার। যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল। ফরিদপুরের জমিদার ও রাজবাড়ী উপজেলার ঠিক কেন্দ্রস্থলে কিংবদন্তী হয়ে রয়েছে। সিরাজগঞ্জের তাড়াশের জমিদার বনওয়ালী লাল রায় তাড়াশ থেকে পাবনা যেতেন ফরিদপুর চিকনাই নদী দিয়ে ঢুকে ইছামতি দিয়ে। বনওয়ালী লাল রায়ের পূর্ব পুরুষ ছিলেন ''চৌধুরাই তাড়াশ'' এর জমিদার বাসুদেব তালুকদার। তিনি ঢাকার ইসলাম খার সরকারী চাকুরী করতেন। নবাব তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ''চৌধুরাই তাড়াশ'' নামক সম্পত্তি তাকে জায়গীর হিসাবে দান করে ''রায় চৌধুরী'' উপাধি দেন। তৎকালীন পরগা কাটার মহল্লা রাজশাহীর সাতৈলের রাজার জমিদারী ছিল। এর ২০০ মৌজা নিয়েই ''চৌধুরাই তাড়াশ'' জমিদারী সৃষ্টি হয়। ফরিদপুর থানার বর্তমান বনওয়ারী নগর এলাকা গভীর বন জঙ্গলে পরিপুর্ণ শিকার উপযোগী স্থান হওয়ায় মাঝে মধ্যেই বনওয়ারী লাল রায় এ স্থানে শিকার করতে আসতেন। জনশ্রুতি রয়েছে, ষোড়শ শতাব্দীর একেবারেই শেষ দিকে লাটের খাজনা দিতে পাবনা যাওয়ার পথে ফরিদপুর থানার বর্তমান রাজবাড়ীর স্থলে বনওয়ারী লাল বিশ্রামের জন্য তাবু খাটান। বিশ্রামের সময় জঙ্গলের পার্শ্বে ''ভেঙ কর্তৃক সর্প ভক্ষণের'' দৃশ্য দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে স্থানটি অতীব সৌভাগ্যের মনে করে তিনি তাড়াশের জমিদার বাড়ীর অনুরূপ চারদিকে দীঘি

খনন করে মাঝখানে সুন্দর বাড়ী নির্মাণ করে তার নাম অনুসারে এ স্থানের নাম বনওয়ারী নগর রাখেন। পরে তাড়াশ থেকে জমিদারির প্রধান অংশ বনওয়ারী নগরে হস্তানন্তর করেন। জমিদার বনওয়ারী লাল রায়ের স্থাপত্য শিল্পে যে প্রখর জ্ঞান ছিল তার প্রমাণ মেলে তারই নির্মিত চারদিকে দীঘি বেষ্টিত একমাত্র প্রবেশ পথ সমৃদ্ধ রাজবাড়ীটির স্থান নির্ধারণ, গঠন ও নির্মাণ শৈলী দেখে। প্রবেশ পথ দিয়ে রাজবাড়ীতে ঢুকতেই হাতি, তীরন্দাজ, ময়ূর ইত্যাদির মুর্তি খচিত গেট বিল্ডিং খুবই চিত্তাকর্ষক। গেট দিয়ে ঢুকে ডান দিকে জমিদারের একতলা রাজস্ব অফিস। এখানে জমিদারের খাজনা আদায় ও প্রজাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণের কাজ হতো। বিল্ডিংটির সুন্দর কারুকাজ এবং গাম্ভীর্য এতই গভীর যে, এখানে ঢুকলে বাসতবিকই দূর অতীতের রাজাদের আমলে মন ফিরে যায় এবং নিজেকে জমিদার বলে খানিকটা ভাবতে ইচ্ছে হয়। এ বিল্ডিং থেকে প্রয় ১শ গজ দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দোতলা

বিল্ডিংটি ছিল কয়েদ খানা এবং টাক শাল। এখানে মোটা মোটা লোহার গ্রিল ও দরজা এবং অন্ধকার কুঠুরি জমিদারদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা স্মরণ করে দেয়। যদিও এ জমিদার তেমন প্রজাপীড়ন করেননি। ডান পাশে মাটির নীচে লোহার সিন্দুকে রাজস্ব আদায় করে রাখা হতো। জানা যায়, উপজেলা পদ্ধতি চালুর পূর্বে বিল্ডিং সংস্কার করার সময় এই সিন্দুকে প্রায় ২৫ লাখ টাকা মূল্যের কাঁচা ধাতব মুদ্রা পাওয়া যায়। বর্তমানে এ বিল্ডিংটি সমাজসেবা, প্রকল্প বাসতবায়ন এবং আনসার ও ভিডিপি অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি থেকে প্রায় ১শ গজ দক্ষিণে জমিদারের মুল বাসভবন। বাসভবন সংলগ্ন দক্ষিণে দীঘির পানির মধ্যে তিনটি ধাপে ছাদবিহীন বিল্ডিংয়ের মত গোসলখানা ও রানীর ঘাট। জমিদার পরিবারের মেয়েদের আভিজাত্য এবং কড়াকড়ি পর্দার কারণে এ রকম গোসলের ঘাট তৈরী হয়। মূল ভবন এখন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসা। সংস্কারের ফলে বিল্ডিংয়ের কারুকাজ ও নকশা পরিবর্তন করা হয়েছে। মূল বাসভবনের অনতি দুরেই দিঘির পাড় সংলগ্ন দক্ষিণ মুখী জমিদারের হাওয়া খানা। বর্তমানে এটি উপবৃত্তি অফিসারের অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ১শ গজ পূর্বে একসঙ্গে লাগানো একতলা বিনোদবিগ্রহ মন্দির ও দোতলা নাট্য মন্দির। এ মন্দির দুটির বৈশিষ্ট হলো, এর গায়ে ছিল হাতি, ঘোড়া, সাপ, তীরন্দাজ খচিত মূর্তি সম্বলিত বিভিন্ন ধরণের অপূর্ব নকশা। নাট্য মন্দিরের দোতলায় বসেই বিনোদবিগ্রহ মন্দিরের সকল পূজার্চনা ও নাট্য মন্দিরের নাচগান ও অভিনয় দেখা যেত। সুদূর কলকাতার অভিনেতা ও জমিদাররাও এখানে আসতেন এবং অভিনয় করতেন। বর্তমানে এটি অফিসার্স ক্লাব হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাজবাড়ী থেকে প্রায় এক হাজার গজ পূর্ব দিকে জমিদারের প্রতিষ্ঠিত দুধ সাগরের পশ্চিম দক্ষিণ পাড় প্রজাদের শিক্ষানুরাগী করে তোলার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন সরোদ গনপাঠাগার। পাঠাগারটির বৈশিষ্ট হলো, এর চারিদিকে খোলা বারান্দা, দরজা ও জানালা। দক্ষিণ দিকে তৎকালে ১০/১২ মাইল পর্যন্ত কোন গ্রাম ছিলনা। ভবনগুলোর বর্তমানে বেশ খানিকটা বেহাল অবস্থা। এ ইতিহাসখ্যাত রাজবাড়ীর মেরামত/সংস্কার জরুরী। এ রাজবাড়ীটিকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে বিষয়টি জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটিতে আলোচনান্তে এর মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পর্যটন সুবিধা প্রবর্তনের নিমিত্তে গঠিত উপ- কমিটি কর্তৃক একটি সম্ভাব্য ব্যয়ের প্রাক্কলন তৈরী করা হয়। এতে ২ কোটি টাকার একটি প্রাক্কলন ধরা হয়। সংশিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে এর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন করা হলে এটি একটি উল্লেখযোগা স্পট হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং পাশাপাশি এই খাতে আয়ের পথ সুগম করা সম্ভব হবে।

জ) পাবনা এডওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কলেজঃ

স্বনামধন্য এ কলেজটি ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়। এটি জেলার প্রাচীন এবং সর্ববৃহৎ মহাবিদ্যালয়। তৎকালীন ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতির স্মরণে ১৯১১ সালের এর নামকরণ করা হয় এডওয়ার্ড কলেজ। তৎপূর্বে এর নাম ছিল পবানা ইনস্টিটিউট। কলেজটি স্থাপনের সময় রায় বনমালী রায় বাহাদুর(জমিদার), অধ্যাপক হেম চন্দ্র রায় (দাতা), গোপালচন্দ্র লাহিড়ী, রাধিকা নাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বিশেষ ভূমিকা ছিল।

১৯৬৮ সালের ১ মার্চ তারিখে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়। উত্তর বাংলার এই বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের জন্য পৃথক চত্বরে সর্বোচ্চ তিনতলা পর্যন্ত প্রাসাদোপম ভবনে বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ে সনাতকোত্তর কোর্স চালু করার মাধ্যমে এটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্যাদা লাভ করেছে।

ঝ) বনমালী ইনস্টিটিউটঃ

উপমহাদেশের বরেণ্য নানা গুনীজনের, দেশী বিদেশী অভিথিবৃন্দের এবং সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আগমনের স্মৃতিঘেরা ঐশ্বর্যের কিংখাবে আকীর্ণ নাম বনমালী ইনস্টিটিউট। যুগের দাবীকে মেটাতে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ মার্চ এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বনমালী হল, কান্ত মেমোরিয়াল স্টেজ ও কিশোরী মোহন স্টুডেন্টস লাইব্রেরী ও অফিস প্রতিষ্ঠাকালীন পরিকল্পনায় তিনে মিলে আজকের বনমালী ইনস্টিটিউট। ধর্ম- বর্ণ- শ্রেণী পেশা নির্বিশেষে সংস্কৃতিমোদী নাগরিকবৃন্দের মতামত আহরণের সম্মিলন কক্ষঃ বনমালী হল, নাগরিকগণের প্রয়োজন উপস্থিাপনযোগ্য সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকান্ডের প্রদর্শনার্থেঃ কান্ত মেমোরিয়াল হল ও মুক্তিবুদ্ধির চর্চার লালন, প্রসারণে উজ্জীবিত করতেঃ কিশোরী মোহন স্টুডেন্টস লাইব্রেরী ও অফিস। এই তিন আন্তরিক ইচ্ছাকে বুকে লালন করেই কালের যাত্রায় সুসময়- দুঃসময়ের চড়াই- উৎরাই পেরিয়ে বনমালী ইনস্টিটিউট আজ তার প্রতিষ্ঠার বাহাত্তর বছর অতিক্রম করছে।